অন্ধকার, অনগ্রসরতা, বিচ্ছিন্নতা ও নিশ্চলতার প্রতীক সামন্তপ্রভু। ইতিহাসে অনিবার্য-অমোঘ নিয়মে রাজশক্তির ক্ষমতার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ও সামন্তের প্রস্থান ঘটেছিল। সমরাস্ত্র উৎপাদনের আর একটি ফলশ্রুতি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আগ্নেয়াস্ত্রের ধ্বংসাত্মক প্রবণতা একদিকে যেমন এযুগে শান্তি-আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, অন্যদিকে তেমনি বিশেষ প্রয়াজনে (অর্থাৎ প্রতিরক্ষা, শান্তিস্থাপন, অবিচারের প্রতিকার প্রভৃতি কারণে) যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তাকে চিন্তাশীল মানুষের একাংশ যুদ্ধকে স্বাগত জানিয়েছিল। অ্যানাব্যাপটিস্টরা মুসা প্রদত্ত দশটি বাণী বা অনুজ্ঞার একটিকে বার বার স্মরণ করে বলেছিলেন 'অবশ্যই হত্যা করবে না' (Thou shalt not kill)। কিন্তু অন্যদিকে যুদ্ধকেও নতুন করে গৌরবান্বিত করা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত অবশ্য এই দুই পরস্পরবিরোধী আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে মানুষ এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে যুদ্ধ ও শান্তি দুটিই সমানভাবে প্রয়োজনীয়। এই প্রসঙ্গে প্রায় সমকালীন একটি রেনেসাঁস চিত্রের উল্লেখ করতে হয়। সেখানে প্রেম এবং মিলনের গ্রিক দেবী বিবসনা-সুন্দরী ভেনাস মতভেদ ও যুদ্ধের দেবতা মার্সকে বশীভূত করেছেন তাঁর প্রেমালিঙ্গনের দ্বারা। অবশেষে উভয়ের মিলনের ফলে Harmony বা ঐক্য নামক একটি কন্যাসন্তানের জন্ম হচ্ছে। দৃশ্যটির প্রতীকী ব্যঞ্জনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২.৬ আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত ও অগ্রগতি (অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত)

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম অবদান ছিল বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি। এক অর্থে এই অগ্রগতিকে 'বৈপ্লবিক' আখ্যা দেওয়া অনুচিত হবে না, কারণ আলোচ্য পর্বে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারসমূহ প্রকৃতি ও ভৌত জগৎ সম্বন্ধে মানুষের প্রচলিত ধ্যানধারণার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে এর বৈপ্লবিক রূপান্তরের সহায়তা করেছিল। কোপারনিকাস পূর্ববর্তী ইউরোপে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রকৃতিলোক সংক্রান্ত ধারণা প্রধানত অ্যারিস্টটলীয় বলবিদ্যা, টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এই ধারণায় নিশ্চল পৃথিবীর অবস্থান ছিল ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র একে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত এবং সমস্ত সৃষ্টির মূলে ছিলেন ঈশ্বর। সমস্ত প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপ বা বিপর্যয়ের যথাযথ বা যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা সেই বিজ্ঞান দিতে পারেনি। আকাশে উল্কা বা অন্য কোনো মহাজাগতিক পদার্থের আকস্মিক আবির্ভাব অথবা জলস্ফীতি, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা বা ফসলহানি অথবা জরা, বার্ধক্য, মৃত্যুর যথার্থ কারণ কী তার উত্তর সেই বিজ্ঞানের জানা ছিল না। কিন্তু ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের নব্য-বিজ্ঞানচর্চা প্রকৃতি ও জীবলোক সম্বন্ধীয় বহু প্রচলিত ধ্যানধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে চিন্তার জগতে এক বিপ্লব ঘটিয়েছিল। সৌরজগৎ,

গ্রহ-নক্ষত্র, শরীর-বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, স্থল ও জলপথের আবিষ্কার ও দিকনির্ণয় সংক্রান্ত যন্ত্র আবিষ্কার প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই যুগের গবেষণা নবদিগন্ত উন্মোচনে সহায়তা করেছিল। গ্যালিলিও, কোপারনিকাস, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, নিউটন প্রভৃতি ছিলেন এই সময়ের বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে এঁরা এঁদের মৌলিক চিন্তাভাবনা, অনুসন্ধিৎসা এবং অন্তর্দৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছিলেন। বলাবাহুল্য, এইসব আধুনিক মানুষের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে রেনেসাঁস ও নব্যমানবতাবাদের অবদান ছিল বিশাল। সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণা হল রেনেসাঁসের প্রভাব শিল্প-সাহিত্যের-দর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বাস্তব হল এই যে নবজাগরণ এবং নব্যমানবতাবাদ যে নতুন ও আধুনিক মানুষের জন্ম দিয়েছিল তাঁরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রেও তাঁদের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন।

মুদ্রণযন্ত্র এবং সামরিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে যেমন প্রাচ্যজগৎ পাশ্চাত্যকে প্রভাবিত করেছিল, বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে প্রায় অনুরূপ প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। শূন্যের আবিষ্কার, 'ব্রহ্মসিদ্ধান্তে' পৃথিবী ও সৌরজগৎ সম্বন্ধে বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানী আর্যভট্টের মৌলিক আবিষ্কার (কোপারনিকাস-গ্যালিলিওর পূর্বে) এবং চৈনিক বিজ্ঞানীর ভাবনাচিন্তা পাশ্চাত্য দুনিয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এক্ষেত্রে আরব বণিকরা পণ্যের আদানপ্রদানের মতো বৈজ্ঞানিক ভাবনাচিন্তার আদানপ্রদানে এবং বিশেষত প্রাচ্যের বাণী পাশ্চাত্যে পৌঁছে দিতে সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হল এই যে ইউরোপীয় পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদদের একাংশের ধ্যানধারণা এখনও (ঊনবিংশ শতকের মতো) তথাকথিত জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের দ্যুতিতে আচ্ছন্ন। Anglo-Saxon প্রভুত্ব ও উৎকর্ষের বাইরে তাঁরা অন্যকিছু ভাবতে পারেন না। ইউজিন এফ. রাইস (Eugene F. Rice) তাঁর *The Foundations of Early Modern Europe* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "...The breakthrough to such a science, so different and so much successful than the sciences of the ancient Greek, the medieval Arabs, the Indians and the Chinese..." অর্থাৎ এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও সমাধানসমূহ প্রাচীন গ্রিক, মধ্যযুগীয় আরব-ভারতীয় ও চৈনিক বিজ্ঞানের তুলনায় সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও সাফল্যমণ্ডিত ছিল। আলোচনার সুবিধার্থে শুধু বাক্যাংশের প্রাসঙ্গিক অংশটুকুই তুলে দেওয়া হল। এই মত পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। প্রকৃত সত্য হল এই—পাশ্চাত্যের বাহুবল এবং পশুশক্তি (সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি) প্রাচ্যকে অধীনতা ও অনগ্রসরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখেছিল। কিছুটা উপযুক্ত প্রচার এবং কিছুটা আত্মবিস্মৃতির জন্য প্রাচ্যের বন্দনা আজও তেমনভাবে গাওয়া হয় না। আবার শুধু প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানমনস্কতাকে প্রভাবিত করেছিল এটাও মনে করার কোনো কারণ নেই। এক্ষেত্রে আধুনিক ইউরোপ

অনেকটাই ঋণী ছিল মধ্যযুগ এবং রেনেসাঁসের কাছে। এমনকি প্রাচীন গ্রিসও আলোচ্য পর্বের বিজ্ঞান সাধনাকে প্রভাবিত করেছিল। একদিকে যেমন পিথাগোরাস এবং ইউক্লিডের মতো গ্রিক গণিতবিদগণ জ্যামিতি চর্চাকে প্রভাবিত করেছিলেন, অন্য দিকে তেমনি হিপোক্রিট আধুনিক ওষধিশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। (হিপোক্রিস্টকে খুব সংগত কারণে 'Father of Medicine' আখ্যা দেওয়া হয়েছে)। ঠিক অনুরূপভাবে টলেমির চিন্তাভাবনা এবং আর্কিমিডিসের সূত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যাচর্চাকে সমৃদ্ধতর করতে সাহায্য করেছিল।

যাইহোক, এই যুগের বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি সুনির্দিষ্ট পর্ব লক্ষ করা যায়। কোপারনিকাসের *On the Revolutions of the Celestial Spheres* (1543) থেকে যে বিজ্ঞানচর্চার সূচনা হয়েছিল, নিউটনের *Principia* (1687)-তে তার পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ করা যায়। আলোচ্য পর্বে যে বিশিষ্ট গবেষণার পদ্ধতি বা method উদ্ভাবিত হয়েছিল তা তিনটি অংশকে আত্মস্থ করেছিল। যথা তর্কশাস্ত্রীয় (logical), পরীক্ষামূলক (experimental) এবং গাণিতিক (mathematical) চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এই তিনটি পদ্ধতি পৃথকভাবে অনুসৃত হয়েছিল। ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে তিনটি পদ্ধতি ধীরে ধীরে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এই সমন্বয়সাধন এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা প্রকৃতির ওপর মানুষের অতুলনীয়-অভাবনীয় জ্ঞান ও দখলের ভিত্তিস্থাপন করেছিল। এই পদ্ধতিগুলিকে যাঁরা প্রাথমিক ও তর্কশাস্ত্রসম্মত রূপ দিয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন প্যারিস ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লজিক এবং দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। এছাড়া, এদের একাংশ তাঁদের মনন ও ভাবনাচিন্তার উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন (রেনেসাঁসের আলোকে) বোলোনা এবং পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র থাকাকালীন।

এই প্রসঙ্গে আলোচ্য পর্বের কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং তাঁদের অবদান আলোচিত হল।

২.৬.১ নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) ও কোপারনিকান বিপ্লবের স্বরূপ

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক নিকোলাস কোপারনিকাস ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে পোল্যান্ডের টোরান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮ বছর বয়সে ক্র্যাকো বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৪৯১-৯৪) পড়ার সময় তিনি সেইযুগের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট রুগেস্কির সংস্পর্শে আসেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন। অতঃপর জ্যোতির্বিজ্ঞান হল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ও চিন্তা। এই পর্বে, অর্থাৎ ১৪৯৭-১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইতালির বোলোনা ও পাদুয়াতেও পড়াশুনা করেছিলেন। অবশ্য এর পাশাপাশি তিনি

চিকিৎসাশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন এবং কিছুকাল চিকিৎসকের পেশায় নিযুক্ত থাকেন। আরও পরবর্তীকালে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক রূপে তিনি প্রকৃত ও সার্থক কর্মজীবন শুরু করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি নির্দিষ্ট সময়ে প্রদক্ষিণ করছে। একটি প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ একদিকে সেইযুগে যেমন কিছু স্বল্পসংখ্যক মানুষ আলোকিত হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এদের বিরূপ সমালোচনা তাঁকে এতটুকু বিচলিত করেনি। তাঁর লেখা কিছু সংখ্যক পুস্তক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর শেষ এবং সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ *Six Books on the Revolutions of the Celestial Spheres* রচনা শুরু করেন। জীবনের একেবারে অন্তিম মুহূর্তে এটি সমাপ্ত ও প্রকাশিত হয় (১৫৪১)।

রেনেসাঁসের যুগ থেকেই মহাকাশ বিজ্ঞানের আলোচনায় টলেমির পৃথিবীকেন্দ্রিক ধারণার (Ptolemaic geocentric system) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল। কোপারনিকাসের যুগান্তকারী আবিষ্কার এই চিরাচরিত চার্চ সমর্থিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। এটাই ছিল কোপারনিকাসের বিরুদ্ধে চার্চের ক্ষোভের মূল কারণ। ১৫১০ থেকে ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর আদি গ্রন্থটি একটি পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি, অর্থাৎ 'Commentoriolus' ছিল তাঁর যাবতীয় গবেষণার সংক্ষিপ্তসার। আরও পরবর্তীকালে তাঁর পূর্ণাঙ্গ পুস্তকটি (ইতিপূর্বে উল্লেখিত) প্রকাশিত হয় (১৫৪৯)।

আর্থার বেরি* মনে করেন যে সমগ্র জ্যোতির্বিজ্ঞান সাহিত্যে *Revolutions*** -এর তুলনা একমাত্র টলেমির *Almagest* এবং নিউটনের *Principia*-র সঙ্গে করা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞান ক্ষেত্রে কোপারনিকাস রচিত এই গ্রন্থের প্রকাশ ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এটি যথার্থই 'বিপ্লব' ছিল। এই বিপ্লবের কেন্দ্রীয় ধারণা—আপাতদৃষ্টিতে গ্রহ-নক্ষত্র জ্যোতিষ্কের যে গতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি তাদের প্রকৃত গতি নয়। গতিশীল পৃথিবীর উপর বসে থাকা পর্যবেক্ষকের গতির জন্যই গ্রহ নক্ষত্রকে গতিশীল মনে হয়। অর্থাৎ জ্যোতিষ্কের যে গতি আমরা পর্যবেক্ষণ করি সেটি তাদের প্রকৃত গতি নয়, আপেক্ষিক গতি। এক্ষেত্রে কোপারনিকাস ভার্জিলের একটি পংক্তিকে উপমা হিসাবে উদ্ধৃত করে সমগ্র বিষয়টি আরো প্রাঞ্জল করেছেন,

* A. Berry, *A Short History of Astronomy*.

** পুস্তকটির সামগ্রিক নাম ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। মূল লাতিন গ্রন্থটির নাম 'Nicolai Copernici torinensis de revolutionibus orbium coelestium Librivi'.

"Provehimur portu, terraeque urbesque recedunt" (বঙ্গানুবাদ ঃ "আমরা বন্দর ছেড়ে পাড়ি দিলাম, দেশ ও নগর দূরে সরে যেতে লাগল")।

শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হিসাবেই সূর্য কেন্দ্রীয় মতবাদ যুগান্তকারী ছিল এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের মানসে এই ঘটনা এক নিদারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। এযাবৎকাল মানুষের এই ধারণা প্রায় বদ্ধমূল ছিল যে তার একান্ত প্রিয় ও সাধের আবাসস্থল এই পৃথিবীই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। একমাত্র তার জন্য একদিন সৃষ্ট হয়েছিল এই পৃথিবী চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্ররা ; তার সুবিধার জন্যই গ্রহদের আবর্তন ও কক্ষ পরিক্রমণ ; তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ ও ভবিষ্যতের সঙ্গে এইসব জ্যোতিষ্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ঐ নিশ্চল নক্ষত্রলোকে চিরশান্তির স্বর্গ বিবদমান, একদিন সেখানেই তার স্থান হবে।

কোপারনিকাসের জ্যোতিষ এই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হেনেছিল। পৃথিবী এখন আর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নয়, অন্যান্য ছন্নছাড়া গ্রহদের মতো

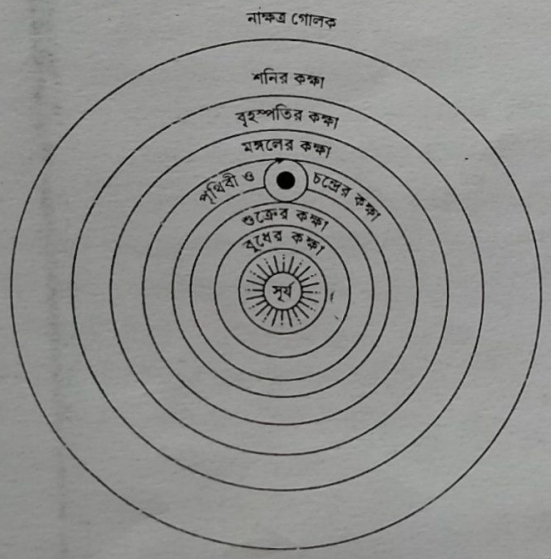

কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনা

সেও তার সমগ্র সৃষ্টি নিয়ে মহাশূন্যে অবিরত ঘুরপাক খাচ্ছে আর হয়রান হচ্ছে। নক্ষত্রলোকও আগের মতো আর নিকটে নেই, মহাশূন্যে অকল্পনীয়-অবিশ্বাস্য দূরত্বে নাকি তার অবস্থান! কোপারনিকাসের কিছুকাল পরে ব্রুনো জানালেন মহাশূন্য অনন্ত এবং আদি-অন্তহীন এবং এতে একাধিক ব্রহ্মাণ্ডলোক বিরাজমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ হঠাৎ নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ও অসহায় মনে করল। এক অতি ক্ষুদ্র, ভ্রাম্যমাণ

গ্রহের নগণ্য অধিবাসী হিসাবে তার সৃষ্টিকে বিধাতার এক বিরাট প্রহসন বলে মনে হয়েছিল। এই অবস্থায় রোমান ক্যাথলিক চার্চ যে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠবে এবং নব্য বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার কণ্ঠরোধ করতে উদ্যত হবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

পৃথিবীর গতি কল্পনা করে গ্রহগুলির আপাতগতির জটিল ব্যাখ্যায় কোপারনিকাস যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করলেও এক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য ছিল আংশিক। সৌরজগতের চাবিকাঠি হাতে পেয়েও শেষপর্যন্ত তিনি এর রহস্যের দুয়ার সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করতে পারেননি। আমরা এখন জেনেছি এর জন্য শুধু প্রয়োজন ছিল বৃত্তের পরিবর্তে উপবৃত্ত পথে গ্রহগুলির পরিক্রমা কল্পনা করা। এই সামান্য অথচ অতীব গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের অভাবে পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্যের সঙ্গে তাত্ত্বিক গণনার ফল মেলাবার অধিকাংশ চেষ্টা তাঁর একপ্রকার পণ্ডশ্রম হয়েছিল। কেপ্‌লার এই পরিবর্তন সাধন করেছিলেন ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে। দুর্ভাগ্যবশত পিথাগোরীয় ও অ্যারিস্টটলীয় ধারণায় আচ্ছন্ন কোপারনিকাস ভাবতে পারেননি যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও একান্ত স্বাভাবিক বৃত্ত ছাড়া আর কোনো জ্যামিতিক রেখাপথে জ্যোতিষ্কদের মতো স্বর্গীয় বস্তুদের আকাশ পরিক্রমা সম্ভব। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে টলেমির সেই পুরাতন কৌশল উৎকেন্দ্রীয় বৃত্ত ও পরিবৃত্তের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি সূর্যকে গ্রহদের কক্ষের ঠিক কেন্দ্রস্থলে না বসিয়ে কিছুটা দূরে বসিয়েছিলেন এবং কয়েকটি গ্রহের উপর একটি করে পরিবৃত্ত চাপিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাঁর সান্ত্বনা ছিল এইটুকু যে টলেমি যেখান ৭৯টি বৃত্ত ব্যবহার করেছিলেন সেখানে তাঁর ৩৪টি বেশি বৃত্তের প্রয়োজন হয়নি।

উপরোক্ত গবেষণা ব্যতীত কোপারনিকাস ঋতু পরিবর্তন, গ্রহ, উপগ্রহ ও চন্দ্র সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেছিলেন এবং অধিকাংশ বিষয়েই তাঁর প্রস্তাবিত সমাধান ও ব্যাখ্যা প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা উন্নততর হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোপারনিকাস পর্যবেক্ষণের উপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেনি। 'অ্যালমাজেস্টে' প্রদত্ত তথ্য ও তালিকাই ছিল তাঁর রচনার প্রধান উপাদান। এই তথ্য যে নির্ভুল নয়, তা নির্ণয়ের জন্য নতুন করে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক সারসরঞ্জামের সংস্কার তথা উন্নতিসাধন যে একান্তভাবে প্রয়োজন কোপারনিকাস সেবিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না।

কোপারনিকাসের স্বকীয়তা সম্বন্ধে পণ্ডিতদের একাংশ প্রশ্ন করেছেন। টলেমির 'অ্যালমাজেস্টের' কাছে তাঁর ঋণ অনস্বীকার্য। তাঁর আগে গ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর একাংশ অনুরূপ কিছু চিন্তাভাবনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে পিথাগোরীয় ফিলোলাউস, অ্যারিস্টার্কাস অফ সামোয় প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। গুপ্তযুগে আর্যভট্ট *ব্রহ্মসিদ্ধান্তে* পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু মত ব্যক্ত করা এক জিনিস ও সমাধানের দ্বারা তার শ্রেষ্ঠত্ব ও অভ্রান্ততা প্রমাণ করা আর এক জিনিস। সূর্যকেন্দ্রিক

পরিকল্পনার প্রথম উল্লেখ হয়তো সুপ্রাচীন কিন্তু এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নানা জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক ঘটনা, গ্রহের গতি, ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলন, ঋতু পরিবর্তন প্রভৃতি নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করতে ইতিপূর্বে আর কোনো ইউরোপীয় বিজ্ঞানী সক্ষম হননি। এটাই কোপারনিকাসের কৃতিত্ব ও স্বকীয়তা।

অবশ্য Revolutions প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর বৈপ্লবিক সম্ভাবনার বিষয়টি সবাই তেমনভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। গ্রন্থের জটিল গাণিতিক আলোচনার আড়ালে কোপারনিকাসের মূল বক্তব্য কিছুটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কিছুকাল পরে ওসিয়ান্দার ইচ্ছাকৃতভাবে মূল গ্রন্থের আংশিক পরিবর্তন করায় অনেকের মনে হয়েছিল পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমা নিছক একটি গাণিতিক পরিকল্পনা, বাস্তব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে এর

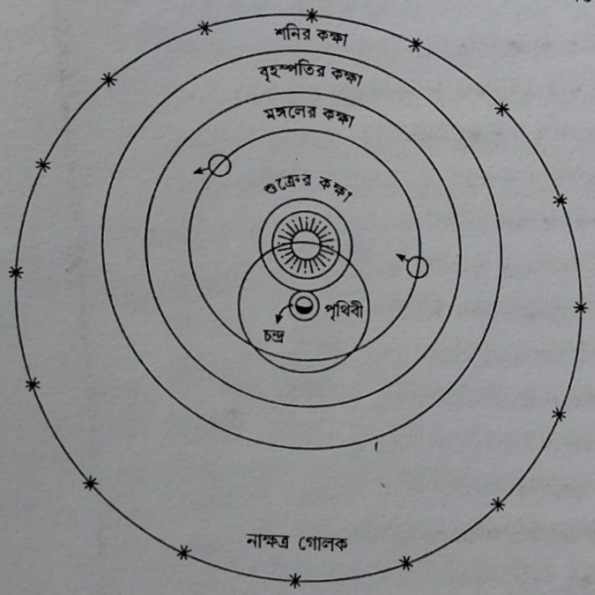

টাইকোর ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনা

কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্য কিছু সংখ্যক বৈজ্ঞানিক কোপারনিকাসের মতবাদের অভিনবত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথম যুগে রাইনহোল্ড, টমাস ডিগ্‌স, ন ফিল্ড প্রভৃতি এই মতবাদ প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। টাইকো ব্রাহে নিজে কোপারনিকাসের তত্ত্বের বিরোধী হলেও 'নোভা' বা নতুন নক্ষত্রের আবিষ্কার করে সনাতন জ্যোতির্বিজ্ঞানের দুর্বলতাকেই প্রকাশ করেছিলেন। সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদের তাত্ত্বিক গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন জিওরদানো ব্রুনো। গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কোপারনিকাসের সিদ্ধান্তকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল।

অন্যদিকে সেই যুগের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের একাংশ কোপারনিকাসের মতবাদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেছিলেন। ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কোপারনিকাসের তত্ত্বের বিরুদ্ধে লেখার জন্য কসিমো দ্য মেদিচি নামক একজন গবেষককে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছিল। এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঐ বছরেই নিউটন ঐ কেম্ব্রিজেই অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে কোপারনিকাস-বিরোধী অপর এক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীর কথা বলা যায়। ইনি ছিলেন পারি মান মন্দিরের অধ্যক্ষ ক্যাসিনি (১৬২৫-১৭১২)। অবশ্য, ঊনবিংশ শতকের সূচনায় ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে রোমান ক্যাথলিক চার্চ প্রথম সরকারিভাবে ঘোষণা করে যে অতঃপর কোপারনিকাসের তত্ত্ব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি ব্যাখ্যা হিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে। যাইহোক, কিছু সীমাবদ্ধতা ও বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও কোপারনিকান বিপ্লবের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

২.৬.২ গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪-১৬৪২)— আধুনিক বিজ্ঞানের জনক

এই যুগের অপর এক বিশিষ্ট মহাকাশবিজ্ঞানী গ্যালিলিও ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে ইতালির পিসা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭ বছর বয়সে তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হন। কিন্তু কোপারনিকাসের মতো তিনিও গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ অনুভব করতেন। একবার সেকালের প্রসিদ্ধ গণিতবিদ্ ইউক্লিডের বক্তৃতা শুনে গণিতের প্রতি অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন। ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে থাকাকালীন তিনি নানা পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার সাহায্যে 'দোলকের সূত্র' এবং 'পতনশীল বস্তুর সূত্র' আবিষ্কার করেন। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *The Starry Messenger* প্রকাশ করেন।

তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন একটি অত্যন্ত উন্নতমানের টেলিস্কোপ যার সাহায্যে তিনি পর্যবেক্ষণ করেন সূর্য-কলঙ্ক, বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ, শুক্র ও মঙ্গলের কলা এবং শনির বলয়। বলাবাহুল্য তিনি ছিলেন কোপারনিকাসের সুযোগ্য ভাবশিষ্য এবং তাঁর তত্ত্বের একজন দৃঢ় সমর্থক। বলাবাহুল্য, তথাকথিত অলঙ্ঘনীয় ধর্মাদর্শের বিরোধিতার অপরাধে তাঁর বিচার হয়েছিল। স্বয়ং পোপ তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে ভর্ৎসনা করেছিলেন। দুঃসহনীয় মানসিক চাপ ও নিপীড়নের সম্মুখে নতিস্বীকার করে তিনি তাঁর উপলব্ধ সত্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ব্যথিত-হৃদয় মানুষটি অতঃপর গ্রামবাসী হন। গ্রামে থাকাকালীন তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে এই ক্ষণজন্মা মহাবিজ্ঞানী শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ লেখক ব্রুস্টার মনে করেন যে প্রায় একই সময়ে টাইকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০১), জোহান কেপ্‌লার (১৫৭১-১৬৩০) এবং গ্যালিলিওর মতো তিনজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর গবেষণায় যুক্ত হওয়ার মতো ঘটনা বাস্তবিকই আশ্চর্য ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিষয়টি ব্রুস্টার তাঁর *Martyrs of Science* গ্রন্থে পর্যালোচনা করেছেন। সুনিপুণ হস্তে নির্মিত উচ্চমানের যন্ত্রপাতির সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে টাইকো ৫৪ বছর বয়সে প্রাগে বসে যে অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তার দ্বারা উত্তরকালে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তি রচিত হয়েছিল, এই তথ্যের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের ফলেই গ্রহ-পরিক্রমা সংক্রান্ত নীতি ও নিয়মাবলী আবিষ্কার করেছিলেন কেপ্‌লার (এক্ষেত্রে তাঁর গাণিতিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য)। প্রায় সমসাময়িক পর্বে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নতুন জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের ইতিহাসে অক্ষয় অবদান রেখেছিলেন গ্যালিলিও।

গ্যালিলিও সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা তিনি একদিকে কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকে যেমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, অন্যদিকে তাঁর বলবিদ্যা বিষয়ক গবেষণা থেকে জন্মলাভ করেছিল আধুনিক বলবিদ্যা ও পদার্থ বিজ্ঞান। বস্তুর গতি ও স্থিতির যথার্থ কারণ ও নিয়ম আবিষ্কার করে এবং এই বিষয়ে প্রায় দুই হাজার বছরের প্রাচীন ও প্রায় নির্বিচারে স্বীকৃত অ্যারিস্টটলীয় মতাদর্শ ও শিক্ষাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছিলেন। তাঁর গবেষণায় নিউটনের যুগান্তকারী আবিষ্কারসমূহ সুনিশ্চিত হয়েছিল। গ্যালিলিও ও নিউটনের পদার্থবিদ্যার প্রয়োগেই কোপারনিকাসের মস্তিষ্কপ্রসূত বৈজ্ঞানিক বিপ্লব শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছিল।

গ্যালিলিওই সর্বপ্রথম আধুনিক বিজ্ঞানী। যে পরীক্ষার কথা রজার বেকন ত্রয়োদশ শতাব্দীর অনুকূল বৌদ্ধিক বাতাবরণে (কিছুটা অস্পষ্টভাবে) উপলব্ধি করেছিলেন, রেনেসাঁসের সূচনায় ফ্লোরেন্সর বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন বিশিষ্ট মানুষ লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি যে আদর্শের কথা উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করেছিলেন, হার্ভে, গিলবার্ট প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের গবেষণায় যে আদর্শ ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল সেটাই পরিপূর্ণ ও প্রায় সর্বাঙ্গসুন্দর রূপে মূর্ত হয়ে উঠেছিল গ্যালিলিওর বৈজ্ঞানিক গবেষণায়।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে উদ্দেশ্যবিহীন পরীক্ষার দ্বারা বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার সম্ভব নয়, পরীক্ষার প্রাপ্ত তথ্যের গাণিতিক বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করে তবেই প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। অত্যাশ্চর্য ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও একাগ্রতার অভাবে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে দীর্ঘদিন যাবত অনুসরণ করার মতো ধৈর্য্যের অভাবে লিওনার্দো তাঁর প্রায় কোনো গবেষণাকেই সম্পূর্ণ করতে পারেননি। পর্যবেক্ষণের

গুরুত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি না করতে পারায় এবং তথ্যের উন্নতি সাধনে তেমনভাবে সফল না হওয়ায় কোপারনিকাস তাঁর যুগান্তকারী পরিকল্পনাকে নানাভাবে জটিল ও দূষিত করে তুলেছিলেন। তাঁর নিজস্ব গবেষণা যে বিশাল সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করেছিল তা তিনি নিজেও ভালো বুঝতে পারেননি। টাইকোর পর্যবেক্ষণ অবশ্য উদ্দেশ্যবিহীন ছিল না কিন্তু গাণিতিক জ্ঞানের অভাবে মূল জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানে তাঁর কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল না। তাত্ত্বিক জ্ঞানে কেপলার গ্যালিলিওর থেকেও অগ্রগামী ছিলেন কিন্তু টাইকোর গ্রহ ও নক্ষত্র তালিকা ব্যবহারের সুযোগ না পেলে কেপলারের অতুলনীয় গাণিতিক দক্ষতাও বোধহয় শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হত।

এই প্রসঙ্গে আরো বলা যায়—লিওনার্দো ছাড়া টাইকো, কেপলার, কোপারনিকাস বা ভেসালিয়াস কেউ সম্পূর্ণরূপে মধ্যযুগীয় বৌদ্ধিক সংস্কারমুক্ত ছিলেন না। এই সংস্কারের পিছুটান তাঁরা মাঝেমাঝেই কমবেশি অনুভব করেছেন। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন গ্যালিলিও। অ্যারিস্টটলীয় ও টলেমীয় মতবাদের অসারতা যেদিন থেকে তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন, সেদিন থেকে সনাতন পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতিষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চিরতরে বিচ্ছিন্ন হল। জীর্ণ বস্ত্রের মতো ঐ দুজনার ভাবধানা তিনি চিরতরে পরিত্যাগ করলেন। এমনকি পাণ্ডিত্য প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে লাতিন ভাষাকেও পরিত্যাগ করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। তার বদলে তিনি পেত্রার্কের আদর্শ বেছে নিয়েছিলেন মাতৃভাষাকে। সহজ, সরল, অলংকার-বর্জিত ভাষায় লেখা গ্যালিলিওর বৈজ্ঞানিক রচনা আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সমতুল্য।

এত স্বল্প পরিসরে গ্যালিলিওর বিশাল বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও আবিষ্কারের বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে একটি সংক্ষিপ্তসার পরিবেশিত হল। প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ২৫ বছর বয়সে তিনি তিন বৎসরের জন্য পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইতিপূর্বেই ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে গ্যালিলিওর প্রথম মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'উদ্‌স্থিতীয় তুলাদণ্ড' (hydrostatic balance)। পিসায় থাকাকালীন তাঁর নত সমতলের (inclined plane) উপর গড়িয়ে পড়ার সময় বস্তুর গতিবেগ প্রভৃতি সংক্রান্ত গবেষণা অ্যারিস্টটলের গতানুগতিক সিদ্ধান্তের উপর চরম আঘাত হেনেছিল। দুর্ভাগ্যবশত রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন গ্যালিলিও তিন বছরের চুক্তিপত্রের মেয়াদ ফুরানোর আগেই পিসা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিছুকাল পরে ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এটাই ছিল তাঁর অধ্যাপনা ও গবেষণা জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। নতুন নক্ষত্র বিষয়ক গবেষণা, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োগ ও তার সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের অসমতা পর্যবেক্ষণ, বহু নতুন নক্ষত্র ও নীহারিকার আবিষ্কার,

ছায়াপথের স্বরূপ নির্ণয়, বৃহস্পতির উপগ্রহদের আবিষ্কার, শনির বলয় সংক্রান্ত গবেষণা—এসব পাদুয়ায় থাকাকালীন (১৫৯২-১৬১০) সম্ভব হয়েছিল।

গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে পোপতান্ত্রিক রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া ও তাঁর করুণ পরিণতির কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। ঐতিহাসিকদের অনেকেই মনে করেন পাদুয়া ছেড়ে চলে যাওয়া তাঁর মারাত্মক ভুল হয়েছিল। তিনি প্রায় জেনেশুনেই ভেনিসীয় সাধারণতন্ত্র ছেড়ে তাস্কেনি গিয়েছিলেন, যে তাস্কেনি ছিল স্বয়ং পোপের খাস তালুকের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর Dialogues on the Ptolemic and Copernican System প্রকাশ করেই তিনি রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। খুব সম্ভবত, ইনকুইজিশন প্রদত্ত দৈহিক নির্যাতন ও ব্রুনোর পরিণতির কথা চিন্তা করে সত্তর বছর বয়স্ক বৃদ্ধ বিজ্ঞান সাধক শহিদের মর্যাদা অর্জন করতে চাননি। শোনা যায়, মার্জনা ভিক্ষা করা সত্ত্বেও তিনি নাকি প্রায় নীরবে স্বগতোক্তি করে বলেছিলেন "E pur Si mouve" (তবুও তা ঘুরছে)। হয়তো এটা নিছক জনশ্রুতি বা গল্প। কিন্তু সেই নিদারুণ বিপর্যয় ও বিড়ম্বনার মুহূর্তে হয়তো সেটাই ছিল তাঁর অন্তরের কথা। (সাম্প্রতিককালে অবশ্য ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষ গ্যালিলিওর প্রতি অবিচার ও অন্যায় নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছে)।

২.৬.৩ জিওরদানো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০)

আলোচ্য পর্বের বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদদের মধ্যে অন্তত একজন বিদ্রোহী রূপে চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ইনি ছিলেন জিওরদানো ব্রুনো। কোপারনিকাসের তত্ত্বকে সমর্থন এবং বিশ্ববিদ্যালয় তথা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারের অপরাধে চার্চ এঁকে গ্রেপ্তার করেছিল। Inquisition বা ধর্মীয় আদালতে বিচারের (বিচারের প্রহসন) পর ইনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। অবর্ণনীয় শারীরিক এবং মানসিক উৎপীড়ন সত্ত্বেও নবজাগরণ প্রসূত আত্মমর্যাদাবোধ ও যুক্তিবাদের দ্বারা চালিত ব্রুনো কিন্তু দোষ স্বীকার করেননি। অতঃপর এই নির্ভীক বিজ্ঞানীকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। সমকালীন শিক্ষিত সমাজ এই নৃশংসতায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ব্রুনোর এই শহিদের মর্যাদাবরণ একেবারে ব্যর্থ হয়নি। এর পরবর্তীকালে কোপারনিকাসের তত্ত্ব আরও প্রসারিত হয়েছিল এবং অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ব্রুনো অন্তত পরোক্ষভাবে Reformation আন্দোলনকেও প্রভাবিত করেছিলেন।

২.৬.৪ জোহান কেপলার (১৫৭১-১৬৩০)

এই যুগের আর একটি বিশিষ্ট জার্মান বিজ্ঞানী জোহান কেপলার ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির ওয়াইল শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। সেখানে থাকাকালীন প্রোটেস্ট্যান্ট

মতাবলম্বীদের সঙ্গে বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তৎকালীন বোহেমিয়ার রাজধানী প্রাগ শহরে চলে যেতে বাধ্য হন। তিনি শুধু কোপারনিকাসের অনুগামী ছিলেন না, তিনি তাঁর তত্ত্ব আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি গ্রহগুলির আবর্তন সম্পর্কে আরও তিনটি নতুন সূত্র প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর একটি সূত্রে প্রথম প্রকাশ পায় যে গ্রহগুলি সূর্যকে উপবৃত্তাকার পথে আবর্তন করে। মহাবিজ্ঞানী নিউটন পরবর্তীকালে কেপলারের সূত্রের সাহায্যে বিখ্যাত 'মহাকর্ষ সূত্র' আবিষ্কার করেন। জ্যোতির্বিদ্যা ছাড়া তাঁর গবেষণার অন্যতম বিষয় ছিল আলোক-বিজ্ঞান এবং গণিত। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *হারমোনিকস্ মুন্ডি* প্রকাশিত হয়।

২.৬.৫ ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬)

ইংল্যান্ডে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথিকৃৎ ছিলেন ফ্রান্সিস বেকন। তিনি অবশ্য প্রকৃত অর্থে বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। তাঁর সমকালীন বা পূর্ববর্তী যুগের ইউরোপীয় মহাদেশে যে সমস্ত যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছিল, তার সম্বন্ধেও তিনি খুব সম্ভবত তেমন ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাঁর প্রধান পরিচিতি ও খ্যাতি একজন সাহিত্যিক, দার্শনিক ও আইনজ্ঞ হিসাবে। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক গবেষণার উজ্জ্বল সম্ভাবনার প্রতি সমকালীন ও আগামী প্রজন্মের মানসে উদ্দীপনা সৃষ্টির কৃতিত্ব তিনি দাবি করতে পারেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞান সাধনার পক্ষে একজন বড়ো মাপের প্রচারক। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য একটি 'অ্যাকাডেমি' বা শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার কথা তিনি বলেছিলেন। যদিও তাঁর যুগে অনুরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর প্রচারের অনুপ্রেরণায় প্রসিদ্ধ রয়াল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্টুয়ার্ট বংশীয় নৃপতি দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে (১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে)। তিনি ছিলেন এই গবেষণা কেন্দ্রের আত্মিক প্রতিষ্ঠাতা।

এছাড়া, বিজ্ঞান সাধনার পক্ষে একটি অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি ছিল তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। ইউরোপের বহু দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষে উপযুক্ত স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশ ছিল না। বিশেষত প্রতি-ধর্মসংস্কারের (counter reformation) যুগে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও ভ্রুকুটি বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অলঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করত যার নিদারুণ প্রতিক্রিয়া অনুভব করেছিলেন ব্রুনো ও গ্যালিলিওর মতো বিশিষ্ট বিজ্ঞান-সাধকগণ। কিন্তু রজার বেকনের উচ্চপদ ও সুখ্যাতি বহু অনুসন্ধিৎসু মানুষকে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ ও ছত্রছায়ায় অবস্থান করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর ব্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষণা-সংক্রান্ত পরিকল্পনার পরিচয় তাঁর ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ডি অগমেন্টিস সাইন্টিয়ারাম (*De Augmentis Scientiarum*) গ্রন্থে পাওয়া যায়।

২.৬.৬ স্যার আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭)

স্যার আইজাক নিউটনের কথা না বললে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কেপলারের প্রভাবে বিখ্যাত মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়নের সময় কেপলারের গতিসূত্র পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল যে সূর্য ও গ্রহের মধ্যে অবশ্যই কোনো আকর্ষণ বল কাজ করে। ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়। এই বিশিষ্ট ইংরেজ বিজ্ঞানীর অন্যান্য যুগান্তকারী আবিষ্কারের মধ্যে অন্যতম ছিল আলোকের গতি সম্পর্কে নতুন তত্ত্ব কণাবাদ, ক্যালকুলাস, বীজগণিতের একটি নতুন সূত্র এবং Law of Motion বা গতির সূত্র। ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর বিখ্যাত *Principia* গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ছিলেন রয়্যাল সোসাইটির উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক।

মধ্যযুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমিত। তখনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্ম হয়নি। পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন তত্ত্ব বা পদ্ধতি মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহারের সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে আদানপ্রদান বা ভাব বিনিময় ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ও প্রসারে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চ। চার্চের মধ্যযুগীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং কুসংস্কারে পরিপূর্ণ মনোভাব বিজ্ঞানচর্চাকে নিরুৎসাহিত ও ব্যাহত করেছিল। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে প্রসার কোপারনিকাস, গ্যালিলিও এবং অন্যান্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা তাঁদের মৌলিক ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারা প্রকাশ করে কীভাবে যাজক সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ইতালীয় চিত্রকর ও যন্ত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির (১৪৫২-১৫১৯) কথাও বলতে হয়। এঁর অসংখ্য স্কেচ্ সংবলিত যে সমস্ত নোটবুক পাওয়া গেছে (এবং যেগুলি আজও সযত্নে সংরক্ষিত) তাতে তাঁর মানবদেহ, অসংখ্য যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর এ বিষয়ে জ্ঞানাদর্শনের প্রচেষ্টা আমাদের আজও বিমুগ্ধ করে। দ্য ভিঞ্চি ছাড়া আরও কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানসাধক এই পর্বের বিজ্ঞান সাধনাকে সমৃদ্ধতর করেছিলেন, যথা—এগ্রিকোলা (স্যাক্সনির চিকিৎসাবিজ্ঞানী, ১৪৯৪-১৫৫৫), উইলিয়াম হার্ভে (ইংরেজ চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং মানবদেহে রক্ত সঞ্চালনের আবিষ্কারক ১৫৭৮-১৬৫৭), ফ্রান্সিস বেকন (ইংল্যান্ডের লর্ড চ্যান্সেলর এবং একাধারে আইনজ্ঞ, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ) এবং রেনে দেকার্তে (দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সমালোচনামূলক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভাবক এবং *Discourse on Method*-এর রচয়িতা ১৫৯৬-১৬৫০)।

আলোচ্য পর্বে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও চিন্তাভাবনা ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বলাবাহুল্য এঁদের চিন্তাভাবনার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। শুধু ইউরোপ নয় সমগ্র বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এযুগের বিজ্ঞানচর্চা। মধ্যযুগীয় কুসংস্কার এবং অন্ধকার থেকে মননের এই মুক্তির মূলে ছিল রেনেসাঁস এবং রেনেসাঁস প্রসূত নব্যমানবতাবাদ।

২.৭ বৈজ্ঞানিক বিপ্লব কতদূর 'বৈপ্লবিক'?

অবশ্য, এযুগের বিজ্ঞানচর্চা যে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ছিল এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। আলোচ্য পর্বে মানুষের অনুসন্ধিৎসা এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও বিজ্ঞানসাধনা প্রথাগত বিশ্ববীক্ষার ক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে সবসময় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। এযুগে জ্যোতির্বিদরা গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন লক্ষ করেছিলেন, কিন্তু সবসময় তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। অবশ্য কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও পরবর্তীকালে সৌরজগৎ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা বলেছিলেন। আর একটি সীমাবদ্ধতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হওয়া সত্ত্বেও মানুষের এক অংশের জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। এদের চোখে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্র প্রায় সমার্থক ছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিলেন রেনেসাঁস পর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী পিকোদেল্লা মিরানদোলা। তিনি আবহাওয়া সংক্রান্ত তত্ত্ব সংগ্রহ করে জ্যোতিষশাস্ত্রের অসারতা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু এনার কয়েকজন সমসাময়িক বিশিষ্ট পণ্ডিত, ফিসিনো ও পন্টানো বংশ, শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাব পুরোপুরি অস্বীকার না করেও গ্রহের তথাকথিত প্রভাবকে অগ্রাহ্য করেননি। অপ-রসায়নবিদরাও গ্রহের প্রভাব কিছুটা মেনে নিয়েছিলেন। এ যুগের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের একাংশ গবেষণা ও ধর্মাচরণকে অভিন্ন বলে মনে করতেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গতি-প্রকৃতির পশ্চাতে তাঁরা ঐশ্বরিক মহিমা লক্ষ করেছিলেন। স্বয়ং নিউটন 'প্রিন্সিপিয়াতে' লিখেছিলেন, "সূর্য, গ্রহ এবং ধূমকেতু নিয়ে অসীম সুন্দর জগৎ গড়ে উঠেছে, তা পরিচালিত হচ্ছে অসম্ভব মেধাবী ও ক্ষমতাসম্পন্ন এক সত্তার আদেশে।" রবার্ট বয়েলের বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রধানত এইসব কারণে এই যুগের 'বৈজ্ঞানিক বিপ্লব' কতদূর 'বৈপ্লবিক' ছিল সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থেকেই যায়। অবশ্য, এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আলোচ্য পর্বের বৈজ্ঞানিক চেতনা তথা চিন্তাধারা যে সামগ্রিক বিচারে 'বৈপ্লবিক' ছিল সেটা অনস্বীকার্য।

২.৮ 'নব্য বিজ্ঞান' কি ধর্মনিরপেক্ষ?

আলোচ্য পর্বের বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানীদের অনেকেই খ্রিস্টধর্মের প্রভাবকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেননি। স্বয়ং নিউটন ছিলেন আস্তিক। সপ্তদশ শতকের বহু বিজ্ঞানসাধক বিশ্বাস করতেন যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে পারে। এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে রোমান ক্যাথলিকদের তুলনায় প্রোটেস্ট্যান্টরাই ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্পর্কের নতুন তত্ত্বে অধিকতর আস্থাশীল ছিলেন। রোমান ক্যাথলিকরা কখনোই দেকার্তের মতো পণ্ডিতকে মেনে নিতে পারেননি, কারণ দেকার্তের মতাদর্শ অ্যারিস্টটল দর্শনকে চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং এই দর্শন ছিল রোমান ক্যাথলিক মতবাদের অন্যতম ভিত্তি স্কলাস্টিক তত্ত্বের প্রেরণা। এবিষয়ে Robin Briggs তাঁর 'Embattled Faiths : Religion and Natural Philosophy in the 17 Century' নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন : "Religion and science were not distinct entities in the seventeenth century, nor were widely seen as being in direct conflict"। অর্থাৎ সপ্তদশ শতকে ধর্ম ও বিজ্ঞানের কোনো পৃথক সত্তা ছিল না এবং এরা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষেও অবতীর্ণ হয়নি। তিনি আরও বলেছেন যে সেই যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানচর্চার পশ্চাতে ঐশ্বরিক (বা স্বর্গীয়) অভিপ্রায় লক্ষ করা যায়। বহু ক্ষেত্রে ধর্মীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আলোচ্য পর্বে বুদ্ধিজীবীরা 'বৈজ্ঞানিক বিপ্লব' সম্পন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। অন্যদিকে যাজক সম্প্রদায় সর্বক্ষেত্রে এবং দলমত গোষ্ঠী নির্বিশেষে 'নব্য বিজ্ঞানের' বিরোধী ছিলেন এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। ধর্মীয় এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বহুক্ষেত্রে সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হত, পরস্পরের অগ্রগতিকে এরা অবরুদ্ধ না করে সমর্থন করত। উভয় ক্ষেত্রেই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রোটেস্ট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিক চিন্তাধারার মধ্যে সাদৃশ্যও লক্ষ করা যায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে পরীক্ষিত সত্য এবং ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যার মধ্যে কখনও কখনও তীব্র বিতর্কের উদ্ভব হত কিন্তু সতর্ক বিশ্লেষণে লক্ষ করা যায় যে এর প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত জটিল এবং উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্যের সীমারেখাও ছিল অস্পষ্ট।

রজার লকিয়ারও মনে করেন যে আলোচ্য পর্বের বৈজ্ঞানিকগণ অধার্মিক ছিলেন না, তাঁরা মনে করতেন যে তাঁদের গবেষণার ফলে ঈশ্বর সম্বন্ধে এক নব্য সচেতনতার উদ্ভব হচ্ছে। কিন্তু তিনি মনে করেন যে প্রচলিত ধ্যানধারণার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় আবেগের তীব্রতাও কমে আসতে থাকে। অবশ্য, আলোচ্য পর্বে ধর্মীয় অনুদারতা পুরোপুরি অন্তর্হিত হয়নি, অ্যানের রাজত্বকালে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টোরি নেতৃবৃন্দ কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের

প্রতি সেই যুগের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল হয় উদাসীন নয়তো কিছুটা সন্দেহবাদী। অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডের সমাজের উপর মহলে একপ্রকার Deism জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস কিন্তু প্রত্যাদেশে (revelation) অবিশ্বাস ছিল এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বরকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চালিকা শক্তির (prime mover) মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ইহলৌকিক দৈনন্দিন জীবনে তাঁর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা ছিল না।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে নব্যবিজ্ঞান কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের উপর আঘাত হানলেও সর্বক্ষেত্রে তা খ্রিস্টধর্ম বিরোধী বা ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না।

২.৯ জীবনবিজ্ঞান ও রসায়নের অগ্রগতি

১৫৫৯ থেকে ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জীবনবিজ্ঞান ও রসায়নের ক্ষেত্রে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি। আলোচ্য পর্বে পদার্থবিদ্যা বা গণিত শাস্ত্রের মতো বিজ্ঞানের এই দুটি শাখায় কোনো যুগান্তকারী বা বৈপ্লবিক আবিষ্কার সংঘটিত হয়নি। এইযুগে জীবনবিজ্ঞান ও রসায়ন ছিল যথাক্রমে চিকিৎসাচর্চা এবং ঔষধিবিজ্ঞান ও ধাতুবিদ্যার উপেক্ষিত সহায়ক। এই দুটি বিজ্ঞান তখনও পর্যন্ত কোনো যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি, মান বা উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

অবশ্য জীববিদ্যার কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষত শব-ব্যবচ্ছেদ এবং শারীরস্থান বিষয়ক, শারীরবৃত্ত এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছিল। ইতালিতে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট গবেষক ও অধ্যাপকবৃন্দ গ্যালেনের চিকিৎসা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত কিছু শিক্ষা ও ধ্যান-ধ্যারণাকে প্রায় ১৫০০ বছর পর সংশোধন ও সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে (অর্থাৎ যে বছর কোপারনিকাস তাঁর বৈপ্লবিক তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন) পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যান্ড্রেয়াস ভেসালিয়াস (১৫১৪-১৫৬৪) নামক একজন বিশিষ্ট ফ্লেমিস শারীরবিজ্ঞানী মানবদেহের বিষয়ে এমন একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন, যা আগামী দিনে এ বিষয়ে বহু নবদিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। গ্যালেনের তুলনায় তিনি অনেক বেশি শব-ব্যবচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এতে সংশোধিত হয়েছিল গ্যালেনের বহু সিদ্ধান্ত। ভেসালিয়াসের গবেষণাপত্রে সুনিপুণ হাতে অঙ্কিত মানবদেহর অস্থি ও পেশিগুলির শৈল্পিক উৎকর্ষ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে ঐ পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্ভের (১৫৭৮-১৬৫৭) একটি গবেষণা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এতে হার্ভে প্রথম মানবদেহে রক্ত সঞ্চালনের বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন। তাঁর গবেষণাও